স্বাধীনতার স্মৃতি-৩

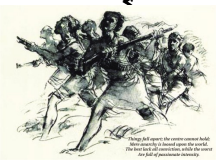

রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ দেখেছি

আতিক রহমান

আবি মৌলবী এক সময় পাকিস্তান আম্পারবাহিনীর একজন কমান্ডার ছিলো। সে সুবাদে স্থানীয় মুক্তি সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ মুক্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দেয়ার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলো। সে স্থানীয় তরুন, ছাত্র ও যুব সমাজকে কাঠের রাইফেল দিয়ে সকাল সন্ধা স্থানীয় স্কুলের মাঠে ট্রেনিং দিতো। মিলিটারী আসার সাথে সাথে ভোল পাল্টিয়ে সে রাজাকার বনে যায়। কিন্তু মিলিটারীরা জেনে ফেলেছিল যে সে মিলিটারী আসার আগ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দিতো এবং রাজাকার কমান্ডার হওয়া সত্বেও মিলিটারীরা সন্দেহ করে একবার তাকে আটক করেছিল। আর তাই মিলিটারীদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে আবি মৌলবী যেন মরিয়া হয়ে প্রমান করতে চাচ্ছিল যে সে ওদেরই লোক। আর এরই খেসারত দিতে গিয়ে মিলিটারীর কাছে ধরিয়ে দেয় বেশ কিছু নিরীহ মানুষ। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো এলাকার আমিন ডাক্তার এবং সুকুমার ডাক্তারের কম্পাম্ডার। আমিন ডাক্তার একসময় পাকিস্তান আর্মির মেডিক্যাল কোরে কম্পাউন্ডারের চাকুরী করতেন। চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে মিলিটারী ব্যারাকের কাছেই এলাকের চৌরাস্তার মোড়ে একটি ফার্মেসী খুলে এলাকার মানুষের সেবা করতেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলো সে নাকি মিলিটারী ক্যাম্পের মেপ এঁকে মুক্তি বাহিনীকে সরবরাহ করেছে। যেই অভিযোগ, সেই কাজ। সাথে সাথে তাকে ধরে নিয়ে মিলিটারীরা গুলি করে মেরে ফেললো।

১৯৭১ শীতের এক পড়ন্ত বিকেলে বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি আবি মৌলবী রিক্সায় করে এক লোককে দু'হাত পিছনে বাঁধা অবস্থায় রিক্সার পায়ের কাছে বসিয়ে মিলিটারীদের ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হাতে তার বিশাল বড় এক রামদা। আর রামদাটা ঠিক লোকটির ঘাড় বড়াবড় ধরে রিক্সার গদিতে বসে আছে সে। আমি প্রথমত একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম; পরখ করে চেয়ে দেখি ও লোকটা আর কেউ না, আমাদেরই চির পরিচিত সুকুমার ডাক্তারের কম্পাম্ডার সুবাস বাবু। সুকুমার ডাক্তার আমাদের পারিবারিক ডাক্তার ছিলেন, উনি যখনই আমাদের বাসায় আসতেন, এই কম্পাম্ডার বাবুকে নিয়ে আসতেন। ডাক্তার বাবুর পিছু পিছু সুবাস বাবু ব্যাগ নিয়ে ঠুকতেন। তার কাজ ছিলো ডাক্তার বাবুর কাজে সাহায্য করা। যেমন তুলার পোটলায় স্প্রিট ঠেলে আগুন ধরিয়ে স্টেনলেস স্টিলের বাটিতে পানি গরম করতেন, আর সেই গরম পানিতে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ ধুইয়ে পরিস্কার করে জীবানুমুক্ত করে নিতেন। স্বল্পভাষী নম্রস্বভারের লোক ছিলেন সুবাস বাবু। আমি এক দৌড়ে মাকে গিয়ে খবরটা দিয়ে এলাম। মা খুব আফসোস করলেন বেচারার জন্য। জানিনা সুবাস বাবুর কি পরিনতি হয়েছিল সেই দিন।

মিলিটারীদের ক্যাম্প আর আমাদের বাসার দুরত্ব ছিলো এক থেকে দেড় কিলো মিটার। চতুর্দিকে পাচিঁল দেয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিশাল কম্পলেক্স, সারি সারি দোতালা তিনতলা দালান, ভিতরে রেস্ট হাউজ, আর তার পাশেই লন টেনিসের কোর্ট, মাথার উপর পানি সরবরাহের বিশাল ট্যাংক, এক পাশে সরকারী ডিগ্রী কলেজ, অন্য পাশে মহকুমার শহরের একমাত্র পশু হাসপাতাল, ওটাই মিলিটারীরা দখল করে ওদের ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করেছে যুদ্ধের পরো নয়টি মাস। রেস্ট

স্বাধীনতার স্মৃতি-৩

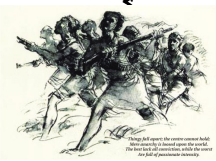

রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ দেখেছি

আতিক রহমান

হাউজে থাকতো মেজর সাহেব। ক্যাম্পের পাচিঁলের লাগোয়া ঠিক পিছন দিকে ছিলো আমাদের কিছু আবাদী জমি। মিলিটারীরা ঐ জমিকেই ব্যবহার করেছে কিল্লিং ফিল্ড হিসেবে। মিলিটারী চলে যাবার পর ওখানে যে কত মরা মানুষের মাথার খুলি দেখেছি তার হিসাব মেলানো যাবেনা। সেই জমিতে আজ শহীদের একটি স্মৃতিস্তম্ভ শোভা পাচ্ছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিগত সরকারের আমলে স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরী করা হয়।

এমনই আর এক রাজাকার ছিলো সদর গার্সল স্কুলের এক বয়স্কা শিক্ষিকা। যার কাজ ছিলো শহরের সুন্দরী রমনী খুজেঁ খুজেঁ মিলিটারীর কাছে তুলে দেয়া। আর এই ঘৃনিত মহিলা রাজাকারের শিকার হোন শহরের অনিন্দ্য সুন্দরী কলেজ ছাত্রী মিতালী বানার্জী*। শ্রুতি আছে শুধুমাত্র পাক মেজরই তার সেবা গ্রহন করতো এবং যুদ্ধের পুরো সময়টাই তাকে ঐ রেস্ট হাউজের চার দেয়ালের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। মিতালী ব্যানার্জীর ছোটভাই তমাল ব্যানার্জী* আমার সহপাঠি ছিল। তমাল আর আমি সরকারী বয়েজ স্কুলে একই ক্লাসে পড়তাম। যদিও ওদের বাসা ছিলো শহরের আরেক প্রান্তে, তবে মাঝে সাঝে ওদের বাসায় আমার যাওয়া হতো। আমি আর তমাল ক্লাসের পরে আরো কয়েকজনের সাথে মনিরুল ইসলাম স্যারের কাছে প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পড়াশুনা করতাম। তমাল আর আমিই সে বছর টেলেন্ট পুলে বৃত্তি পেয়েছিলাম বয়েজ স্কুল থেকে, আর সদর গার্লস স্কুল থেকে একমাত্র নিলীমা। দেশ স্বাধীন হবার স্বল্প কিছুকাল পরেই বোন মিতালী বানার্জীর এই গ্লানি মাথায় নিয়ে তমালরা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়। আজও মনে ভাসে তমালের সাথে আমার স্কুল জীবনের সেইসব দিনগুলোর স্মৃতিকথা। (* ছদ্মনাম)

পাঠক, আমার কৈশর জীবনের সাথে স্বাধীনতার যুদ্ধের দিনগুলোর স্মৃতি এতোই প্রশ্বস্থ যে যতই লিখছি, আমার বুকের ভিতর জমে থাকা সব অতীত স্মৃতিগুলো যেন বরফের মত একে একে গলে গলে পড়ছে, আর মনের পর্দায় ভেসে ভেসে আসছে সেইসব হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা। আবেগে ব্যাথায় আমার মন আপ্লুত হয়ে পড়ছে, কলম আমার আর থামতে চাইছে না। আমায় ক্ষমা করবেন পাঠক যদি এতে আপনাদের ধৈর্য্যের এতটুকু ব্যাচুতি ঘটাই। আমার স্বাধীনতার স্মৃতি অসমাপ্তই থেকে যাবে যদি না এখানে আমি ১৯৭১ এর আগের কিছু কথা না লিখি।

আমি আগেই বলেছি আমাদের পাড়াটা ছিলো একটি শিক্ষিত রাজনৈতিকভাবে সচেতন মহল্লা। পাড়ার প্রায় সব কলেজে পড়ুয়া ভাইয়েরা ও বোনেরা একটা না একটা ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। কেউ ছাত্রলীগ কেউবা ছাত্রইউনিয়ন করতো। তবে কেউ এনেসেফ বা ইসলামি ছাত্র সংগঠন করতো না। এনেসেফ [এনএসএফ] ছিলো তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানের সরকারী দলের পৃষ্টপোষ্কতায় লালিত একমাত্র ছাত্র সংগঠন। অন্য পাড়ার লোক মোতাছিম বিল্লাহ নামক একজন ছিলেন এনেসেফ-এর নেতা। শুনেছি ওনার কাছে নাকি সবসময় পিস্তল থাকে, উনি মোনায়েম খানের লোক। আমার মেঝো ভাই ছিলো তখন ছাত্রলীগের একজন ডাকসাঁইটে নেতা। সেই সুবাদে আমাদের

স্বাধীনতার স্মৃতি-৩

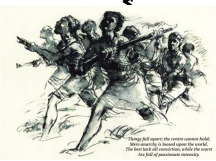

রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ দেখেছি

আতিক রহমান

বাসার বৈঠকখাণায় চলতো মহকুমা শহরের ছাত্র রাজনীতির নিয়মিত চর্চা। কলেজের ভিপি জিএস'সহ আরও অনেক ছাত্রনেতারা ঐ ছাত্র রাজনীতির আড্ডায় নিয়মিত সামিল হতেন। মেঝো ভাইয়ের বন্ধু নাছির ভাই, মোস্তফা ভাই, জুলু, সাইফুল্লা, সালেহ ভাই, মাকছু, মিজান, ভাইসহ আরো অনেকে আমাদের বৈঠকখানায় নিয়মিত আসতেন। মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে দিতেন, "যা খালাম্মাকে গিয়ে বল আমাদের খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দিতে"। মা যখন যা থাকতো খেতে দিতেন। কিছু না থাকলে গামলা ভরে মুড়ি আর বাটি ভর্তি নারকেল পাঠিয়ে দিতেন। বাবা মেঝো ভাইয়ের এসব রাজনৈতিক কার্যকলাপ খুব একটা ভাল চোখে দেখতেন না। প্রায়সঃ বড় ভাইয়ের তুলনা দিয়ে পড়াশুনা উচছন্নে যাবে এনিয়ে মেঝো ভাইকে তিরস্কার করতেন। বড় ভাই এসবে ছিলেন না, উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের কোন একটি বিষয়ে পড়াশুনা শেষ করে বিনা বিপত্তিতে বিজ্ঞান গবেষনা পরিষদে গবেষনা কর্মকর্তার চাকুরী পেয়ে গিয়েছিলেন। মেঝো ভাইয়ের প্রতি বাবার প্রত্যাশা তেমনটিই ছিলো।

আমাদের বৈঠকখাণায় বাবা'র ল'এর বইয়ের আলমারী এবং বসার চেয়ার টেবিল ছাড়াও দু'খানা খাটিয়া ও আরও কিছু আসবাবপত্র ছিলো। মেঝো ভাই কলেজে উঠার পর থেকে বৈঠকখাণায়ই থাকতেন। আমিও মাঝে মাঝে মেজো ভাই'র সাথে বৈঠকখানায় থাকতাম। একদিন খবর এলো তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের আইন মন্ত্রী কলেজে আসবেন। রাত জেগে মেঝোভাইসহ এসব ছাত্রনেতারা কলেজ এবং আশেপাশের চত্বরে, দেওয়ালে, রাস্তায় সারারাত চিকা মেরেছিলেন। বিশাল বিশাল অক্ষরে আলকাতরা দিয়ে প্রতিবাদী সেসব লেখা; পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা। সকাল হয় হয় এমন সময় তারা খালি মাটির আলকাতরার হাড়ি আর খেজুরের ঠগার ব্রাস নিয়ে আমাদের বৈঠকখানায় ফিরলেন । দুপুরের দিকে সাইরেন বাজিয়ে মন্ত্রী এলেন কলেজে। ছাত্ররা দাবী দাওয়া নিয়ে মন্ত্রীকে ঘেরাও করলো। মন্ত্রীর মিটিং পন্ড হয়ে গেলো। পুলিশ ফাকাঁ গুলি করে ছাত্রদের ছত্রভংগ করে মন্ত্রীকে উদ্ধার করলো। সাথে সাথে মাইক বাজিয়ে শহরে জারী করা হলো ১৪৪ ধারা। শুরু হয়ে গেলো ধরপাকড়। যেসব ছাত্রনেতারা আমাদের বাসার বৈঠকখানায় নিয়মিত আসতেন, সবাই গা ডাঁকা দিয়েছিলেন। বৈঠকখানার রাজনীতির আড্ডাটা কিছুকালের জন্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আমি বড়দের রাজনীতির আড্ডা শুনতাম, বুঝতাম না তেমন কিছুই, তবে মনে মনে একধরনের ছবি আঁকতাম। শুনেছি মোনায়েম খানের কোন বাপ মা নেই, আইয়ুব খানই ওনার বাপ। শুনতাম, পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র খান আব্দুল গাফফার খানই বাঙ্গালীদের পক্ষে, ফাতেমা জিন্নাহও তত খারাপ না, তবে আর কেউ নেই আমাদের বাঙ্গালীদের পক্ষে। এসব শুনে আমার বালক মনে নিজেকে জাতিসত্তার সাথে একাত্ম করে বড় অসহায় বোধ করতাম।

আমাদের দালানের আর বৈঠকখানার মাঝখানে বেশ খানিকটা খালি জায়গা ছিলো। তার একপাশে ফলফলাদির গাছ, আর অন্য পাশে ছিলো ছোট্ট একখানা ফুলের বাগান। বাসার অন্যদের বাগানের প্রতি কোন আগ্রহ ছিলো না। বাগান করা আমার খুব ছোট্ট বেলার সখ, আর তাই এখান

স্বাধীনতার স্মৃতি-৩

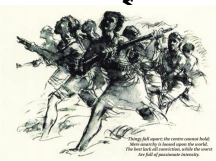

রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ দেখেছি

আতিক রহমান

ওখান থেকে ফুলের গাছ এনে বাগান সাজিয়ে ছিলাম। বাগানে গাঁদা, অফিস টাইম, গন্ধরাজ, বেলী, গোলাপ ইত্যাদি নানান রকম ফুল ছিলো। হঠাৎ একদিন বিকেলে পাড়ার মাহফুজ ভাই রিক্সা থেকে নেমে এক লাফে আমার বাগানে ঠুকে পড়লো। আর নির্বিচারে আমার বাগানের সব ফুল তুলে নিয়ে আবার একলাফে রিক্সায় উঠে চলে গেলো। মাহফুজ ভাই তখন কলেজে পড়ে, ছাত্রইউনিয়নের বিশাল নেতা। আমি চেচামেচি করে বাঁধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্ত কে শোনে কার কথা, কোন কিছু বোঝার আগেই আমার বাগান সাফ করে উনি আবার রিক্সায় চেপেঁ উধাও হয়ে গেলেন। আমি কান্নাজড়িত কণ্ঠে মায়ের কাছে গিয়ে বললাম। মা পরখ করে দেখলেন, হ্যাঁ, ঘটনা সত্য, পুরো বাগান সাফ। আমাকে বললেন, যা, তুই মাহফুজ'র মায়ের কাছে গিয়ে বলে আয়। আমি খালাম্মার কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। খালাম্মা বললেন, কাদিস্ না, বল কি হয়েছে। আমি কান্নাজড়িত কণ্ঠে খালাম্মাকে ঘটনা খুলে বললাম- মাহফুজভাই আমার বাগানের সব ফুল তুলে নিয়ে গেছে। খালাম্মা আমাকে বললেন, কাঁদিস না, যা বাড়ী যা, ও আসুক আগে, ওকে জিগ্যেস করি, কেন এভাবে জোড় করে ফুল নিয়েছে। আমি আস্বস্তি নিয়ে বাসায় ফিরলাম। মাহফুজ ভাই সন্ধায় আমাদের বাসায় এসে মায়ের সাথে দেখা করেলেন। আর বললেন–হঠাৎ করে ডাকসু'র ভিপি চলে এলো খালাম্মা, ওনাকে ফুল দিয়ে বরন করতে হবে, এখন ফুল কোথাই পাই বলুন, তাই এভাবে নিতে হয়েছে, ওকে একটু বোঝানতো খালাম্মা। মা আমার সেদিন কি বুঝেছিলো জানিনা। তবে ডাকসু'র ভিপি যে কি জিনিষ, আর কেনই বা তাকে ফুল দিতে হবে, তাও আবার আমার বাগান সাফ করে, তার মাথামুন্ড আমি কিছুই বুঝতে পারিনি সেদিন।

পড়ে সেই ডাকসু'র ভিপিকে চিনলাম। একটা ফিফটি হোন্ডা মটরসাইকেলে করে পুরো শহর ঘুরে বেড়াতেন, আর তার রাজনীতির প্রচারনা চালাতেন। একদিন দেখলাম শহরের চৌরাস্তার মোড়ে মটরসাইকেল থেকে নেমে তিনি এক বৃদ্ধ চাচার বয়ষী লোকের পা ছুয়ে ছালাম করলেন । উপস্থিত জনতা বলে উঠলেন; কি সোনার টুকরো ছেলে। ডাকসু'র ভিপি তাও কিনা আবার আমাদের শহরেরই ছেলে, গর্বে আমার বুক ভরে গিয়েছিলো। একধরনের শ্রদ্ধাবোধ জন্মে ছিলো সেদিন এই ছাত্রনেতার উপরে। আমি পড়ে বড়দের সাথে সাথে তার প্রায় প্রতিটি মিটিংয়ে যেতাম। দারুন বক্তা, কি অগ্নিঝড়া তার বক্তৃতা, আফিমের মত কেমন যেন একটা নেশা ধরে গিয়েছিলো। আমাদের চন্দ্রঘোনার কাগজের মিলের কাগজ পাকিস্তান যায় শুধু ওদের সিলের জন্য, আমরা কিনি বারো আনা দিস্তা, ওরা কিনে ছয় আনায়। ওরা খায় আমাদেরই উৎপাদিত বালাম চাল, আর আমাদের ভাগ্যে মোটা ভাত মোটা কাপড়ও জোটে না। এ এক অসহ্যকর বৈষম্য, কোনভাবেই এ মানা যায় না। অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলো এই বালক মন সেদিন, দেশ স্বাধীন হবে, কোন নৈরাজ্য, শোষন, বৈষম্য থাকবে না।

শহরের বিশিস্ট আলেম ও মিউনিসিপালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান মন্তাজ মওলানা ছিলেন তার বিশিস্ট পৃস্টপোশক। এই যুবক ছাত্রনেতার সপক্ষে সেদিন তিনি বক্তৃতা দিতেন প্রায় প্রতিটি মিটিংয়ে। মওলানা মন্তাজ উদ্দীন ছিলেন উচ্চতায় ছয়ফুটের উপরে, শশ্রুমন্ডিত এক বিশাল ব্যাক্তিত্ব। জনশ্রুতি

স্বাধীনতার স্মৃতি-৩

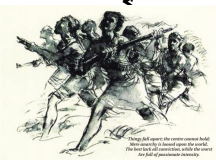

রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ দেখেছি

আতিক রহমান

আছে উনি একাই নাকি একটা প্রমান সাইজের কাঁঠাল একবারে খেয়ে ফেলতে পারতেন। তিনিই প্রথম মওলানা এবং মুরুব্বী গোছের কেউ যে সেদিন এই তরুন ছাত্রনেতার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তার পরিচিত বাড়লো; সেই ডাকসু'র ভিপি একদিন এমপি হলেন, এমপি থেকে মন্ত্রী হলেন। তোরনের পর তোরন তৈরী হতো তার নিজ শহরে আগমন উপলক্ষে। গাড়ীর পর গাড়ী, মটর সাইকেলের বিশালবহর তার গাড়ীর সামনে পিছনে। কিন্তু যে তরুন নেতাকে আমার মত একজন অখ্যাত বালকের বাগানের ফুল দিয়ে মহকুমা শহরের ছাত্রজনতা বরন করেছিলো সেদিন, বড় হয়ে সেই নেতাকে আর সেভাবে খুঁজে পাওয়া যাইনি। বিশাল এক ব্যবধান তৈরী হয়ে গিয়েছিলো সেদিনের তিনি আর আজকের তিনির মধ্যে। যেসব নিবেদিত প্রান এই তরুন ছাত্রনেতার উত্থানের পিছনে অক্লান্ত এবং নিস্বার্থভাবে কাজ করেছিলেন সেদিন, তার বড় হওয়ার পড়ে অনেকেকেই আর তার পাশে খুঁজে পাওয়া গেল না। বড় দুঃখ হয় আজ সেইসব দিনেরগুলোর স্মৃতি মনে পড়লে। আমার কচি বালক মন অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলো সেদিন এই ছাত্রনেতার বক্তৃতা শুনে।

একই মহকুমা শহরের আরেক প্রান্তে জন্ম নিয়েছিলো আরেক নিবেদিত প্রান রাজনীতিবিদ নলিনী দাস। মাস্টার'দা সুর্যসেনের সংগে যে জেল খেটে ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে, আন্দামান নিকোবরে যাকে কালাপানি দেয়া হয়েছিলো। তার উত্তরসুরীরা আজ কেউ কোন সরকারী বা রাজনৈতিক পদে নেই। অসৎ উপায়ে বিশাল সম্পত্তির পাহাড় গড়ে রেখে যাননি তিনি। মৃত্যুর পূর্বে সে তার বাস্তুভিটাটুকু পর্যন্ত দান করে গিয়েছেন শহরের একমাত্র দাতব্য চিকিৎসালয় ও কলেজের নামে। এর নাম ত্যাগ, এর নাম জনগনের জন্য ভালবাসার রাজনীতি। হোক সে ভিন্নধর্মের লোক, জাতের নামে বজ্জাতি আর ফেৎতনা ফেসাদের উর্দ্বে এসব মহাত্মা। আমি এদের মনে প্রানে শ্রদ্ধা করি।

সত্তরের মহাপ্লাবনে যখন মেঘনা পাড়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ বানের জলে ভেসে গিয়েছিলো, দেশ বরেন্য জননেতা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুসহ দেশ বিদেশের বহু বড় বড় নেতা আমাদের মহকুমা শহরে এসেছিলেন। ত্রান কাজে বহু বিদেশী সংস্থার সাদা চামড়ার লোক দেখেছি সেদিন আমাদের ছোট্র শহরের অলিতে গলিতে। মনে আছে স্থানীয় বাংলা স্কুলের মাঠে মরহুম জননেতা ভাসানীর দেয়া বক্তৃতার কথা। উনি ইয়াহিয়া খানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিনেন; কোথায় আপনি, আসুন, দেখে যান, কিভাবে আমার মৃত মা'বোনদের সম্ভ্রম বিনষ্ট হচ্ছে, কিভাবে বিনা কাফনে কলাপাতা মুঁড়িয়ে আমার ভাইবোনদের ধাফন করা হচ্ছে।

১৯৭১ পৌষের এক সকাল। হঠাৎ করে আমাদের দূর সম্পর্কীয় এক মামা, মিজান মামা নামে পরিচিত, সাথে একজন অপরিচিত লোক নিয়ে আমাদের বাসায় আসলেন। সকাল আট নয়টা হবে হয়তো। মিজান মামা অপরিচিত ভদ্রলোককে বসার ঘরে বসিয়ে নিজে ভিতরের ঘরে গেলেন এবং সবার সাথে আলাপ চারিতায় লিপ্ত হলেন। মা এদের চা নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত। মিজান মামা আমাকে এক পাশে ডেকে চুপিসাড়ে বললেন, যা তো, একটু কলেজ চত্বর থেকে ঘুরে আয়, দেখে

স্বাধীনতার স্মৃতি-৩

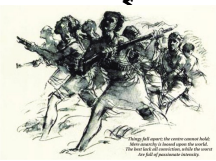

রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ দেখেছি

আতিক রহমান

আয় ওখানে কি হচ্ছে, কোন মিলিটারীর গাড়ী টারী আছে কিনা। আমি কাউকে কিছু না বলে মামার কথা মতো সোজা মিলিটারীর ক্যাম্পের সামনে দিয়ে গিয়ে ঘুরে পুরো কলেজ চত্বর একদমে চৌকি দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। দেখে এলাম, ক্যাম্পের গেটে বন্দুকধারী দুই তিনজন সিপাহী পাহাড়া দিচ্ছে। তবে ক্যাম্পের প্রাচীরের কিছুদুর পর পর বালির বস্তা দিয়ে ইদানিং পাহারা আরো জোরদার করা হয়েছে। কলেজ চত্বরে চোখে পড়ার মতো কিছু দেখলাম না। সাথে সাথে বাসায় এসে মামাকে সব বললাম। মিজান মামা চা নাস্তা খেয়ে তড়িঘড়ি করে ঐ অপরিচিত লোকটিকে নিয়ে বেড়িয়ে গেলেন। প্রায় ঘন্টা খানেক বাদেই কলেজ এলাকায় শুরু হয়ে গেলো ভয়ংকর যুদ্ধ। প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর্যন্ত চললো অবিরাম গোলাগুলি। প্রথমে হাল্কা গুলির শব্দ, তারপরেই গর্জে উঠলো পাকিদের হেভি মেশিন গান। প্রচন্ড সে গুলির আওয়াজ। পাড়ায় হুলুস্থুল পড়ে গেলো, আমরা মাটিতে শুয়ে পড়লাম, রাস্তায় পথচারী যারা ছিলো দৌঁড়ে এসে আমাদের দালানের আবডালে আশ্রয় নিলো। ঐদিন ছিলো কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষা। ছাত্ররা পরীক্ষার হল ছেড়ে যে যেদিকে পারলো পালালো। বানচাল হয়ে গেলো পরীক্ষা, মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য সফল হলো। দেশ স্বাধীনের পরে মিজান মামার কাছে জানতে পেরেছি ওনারাই সেদিন কলেজে গেরিলা আক্রমন করে ডিগ্রী পরীক্ষা পন্ড করে দিয়েছিলেন এবং আমাকে দিয়ে ছোটখাট একটা রেকি করে নিয়েছিলেন সেদিন। দিনে দুপুরে পাক আর্মির ক্যাম্পের অতি সন্নিকটে কলেজে সেদিনের মুক্তিবাহিনীর আক্রমনে এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিলো যে পাকিদের শেষদিন আর বেশী বাকী নেই। একাত্তরের নভেম্বর মাস প্রায় শেষ। মিলিটারীদের দৌড়াদৌড়ী এদিকে ক্যাম্প আর অন্যদিকে পাওয়ার হাউজ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো। প্রায় প্রতিরাতেই গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যায়, আর ভয়ে আমরা পাড়ার সবাই যেন একরকম সেঠিঁয়ে গিয়েছিলাম।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান ইন্ডিয়া যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। পাকিরা ইন্ডিয়ার আর্মি ও মুক্তি বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর হাতে মার খাওয়া শুরু করেছে বিভিন্ন রনাঙ্গনে। খবর এলো পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তেও যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং পাকিরা ওখানেও সুবিধা করতে পারছে না। আমরা মহা খুশী। রেডিওতে আকাশবানীর দুপুর দুইটার "দেবদুলাল বন্দোপ্যাধায়' এর পঠিত বাংলা সংবাদ ছিলো বাসার সকলের বিশেষ আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দু। রাতে বিবিসির বাংলা সংবাদ এবং ভাষ্যকার সিরাজুল ইসলামের সংবাদ পর্যালোচনা, আর এর সাথে থাকতো আগরতলা থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রক্ত গরম করা দেশাত্ববোধক ও গান; একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি.....।

৯ই ডিসেম্বর ১৯৭১, দুপুরে হঠাৎ দেখি মিলিটারীর লম্বা মার্চ। প্রথমে একটি খোলা জীপ কয়েকজন পাকি সিপাহী তাতে, জীপের উপরে মেশিনগান তাক করে দাঁড়িয়ে আছে এক জোয়ান। পিছনে দুই সারিতে সিপাহিদের লম্বা লাইন, প্রত্যেকের মাথায় হেলমেট, কাঁধে ঝোলানো অটোমেটিক রাইফেল, পিঠে মস্তবড় পেটড়া; পুরো যুদ্ধের সাঁজে বুটের খট খট আওয়াজ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে । আর সিপাহি লাইনের পিছনে কয়েকটা জীপ, আর তারও পিছনে বড় বড় বেশ কয়েকটা আর্মি

স্বাধীনতার স্মৃতি-৩

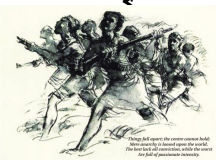

রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ দেখেছি

আতিক রহমান

ট্রাক। বাসার সবাই বলাবলি শুরু করলো “ওরা চলে যাচ্ছে”, “ওরা চলে যাচ্ছে”। সবার মুখে মুক্তির এক উৎফুল্লের হাসি। আমি নির্বাক হয়ে বাসার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঔ নরপশুদের চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করে আকাশে যুদ্ধ বিমানের প্রকট আওয়াজ। মুহুর্তের মধ্যে আওয়াজ আরো প্রকটতর হলো। দেখলাম আকাশে দুটো যুদ্ধ বিমান খুব নিচু হয়ে মিলিটারী লাইনের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো। মা আমায় ভিতর থেকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, ভিতরে আয়, জলদি ভিতরে আয়। আমি মজা করে পাকিদের মার্চ করে চলে যাওয়ার দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। মায়ের জন্য তা আর হলো না। বাড়ীর ভিতরে চলে গেলাম। আর পরক্ষনেই শুনলাম এন্টি এয়ারক্রাফট এর বড় বড় গুলির আওয়াজ। পাকিরা মার্চ করে শেষবারের মতো খেয়াঘাটের দিকে চলে গেলো, ওখানে আগে থেকেই তৈরী ছিলো গানবোট ওদের পলায়নের জন্য। সন্ধ্যা নাগাদ মুহুর্মুহু হাল্কা এবং ভারী গোলাগুলির আওয়াজ শুনা গেলো খেয়াঘাট এলাকা থেকে। ঐদিন বিকেলেই মুক্তিবাহিনী শহরে ঠুকে পড়লো। আর এভাবেই ঐদিন স্বাধীন হয়েছিলো আমাদের মহকুমার ছোট্র শহর। -- ক্রমশঃ